ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু - ৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

বিজ্ঞান অন্বেষক

ভিতরের পাতায়
সাপের ও বিষের প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার, রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ পরিবেশ বিপর্যয়, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে বিজ্ঞান।

বর্ষ-১২ সংখ্যা - ৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

একজন মৌলির অভিজ্ঞতা

মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবারভাই।
ঐ ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

মৌমাছি আর মধু নিয়ে জানবার যেন শেষ নেই। প্রকৃতিতে মধু কমে যাচ্ছে এই রকমটাই শোনা এবং বোঝা যাচ্ছে। আসলে সমস্ত বিজ্ঞানটাই চলে পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। আসলে শিক্ষিত কিছু মানুষ মৌমাছি প্রতিপালনের ট্রেনিং নিয়ে বাক্স দিয়ে মৌ চাষ করছেন কিন্তু বংশ পরম্পরায় সুন্দরবন সহ প্রতিটি জেলায় বহু মৌ সংগ্রাহক আছেন যাঁরা শুধু চাক ভাঙা মধুর ওপরই নির্ভরশীল। সকাল হলেই তাঁরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েন কোথায় একটা মৌমছির চাক পাওয়া যাবে তার সন্ধানে। সারাদিন এই রকম একজন মৌলির সাথে ঘোরার অভিজ্ঞতা লিখলাম।

আমি একটা মৌমাছির চাক দেখিয়ে বলে ছিলাম এই চাকে মধু আছে কি করে বুঝব।

উঃ- মধু যখন চাকে থাকবে দূর থেকে রোদের আলোয় মৌচাকটি চকচক করব কিন্তু আবহাওয়া বিরূপ হলে মৌমাছিরা মধু মুখে নিয় বসে থাকে তখনও চাক চকচক করে। তাই মাছি কম আছে আর চাক চকচক করছে তা দেখে বোঝা যাবে মৌচাকে মধু ভর্তি।

এরপর 4 পাতায়

কৃত্রিম প্রজনন - বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের একটি ধাপ

বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্য্যে ভারতবর্ষ যুগযুগ ধরে সমৃদ্ধ। এটা খানিকটা আমাদের অহংকার, গর্ব কিংবা আলাদিনের চিরাগের মত মনে হতে পারে যেখানে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর এমনই এক দেশ যেখানে ১০০ কোটি মানুষের বাস হলেও অন্তত ঃ ৫০ কোটী মানুষ বহির্ভূত অন্যান্য প্রাণী বসবাস করে। সারা পৃথিবীর শতকরা ৬৫ ভাগ বাঘ (ডোরাকাটা), এশিয় হাতি এবং শতকরা ৮৫ ভাগ একশৃঙ্গি গন্ডার পাওয়া যায় এখানে। প্রায় ৩৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১২২৪ প্রজাতির বিভিন্ন পাখি, ৪০৮ প্রকারের সরীসৃপ, ১৯৭ প্রকারের উভয়চর, ২৫৪৬ প্রকারের মাছ, ৫৭,৫৪৮ প্রজাতির কীটপতঙ্গ এবং ৪৬,২৮৬ প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায় ভারতের মাটিতে। সবমিলিয়ে সারা বিশ্বের অন্তত শতকরা ৮ ভাগ জৈববৈচিত্র্য পাওয়া যায় এদেশে।

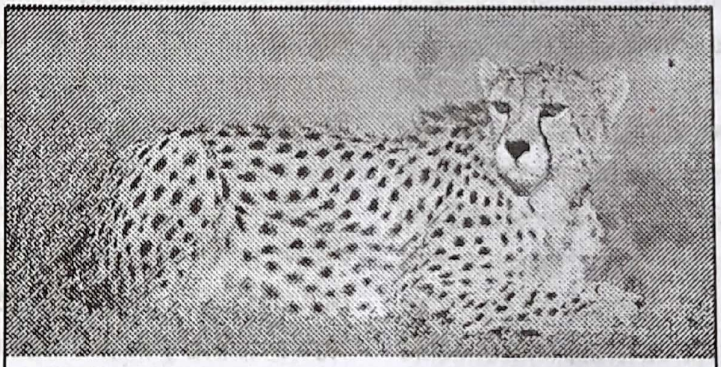

এশিয় চিতা ছবি ঃ লেখক

এত জৈববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভিদ ও প্রাণীরা কিন্তু খুব একটা স্বস্তিতে নেই এখানে। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় ভারতে বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদরা অনেক বেশি বিপন্ন।

ভারত সরকার ইতিমধ্যে সারা ভারতে ৮৬টির মত জাতীয় উদ্যান এবং ৫০০টির মত অভয়ারন্য তৈরি করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ২৮টি ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং ২৫টি হস্তি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে যা দেশের অরণ্য সম্পদের ২৫ শতাংশকে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়া সম্প্রতি কুমীর প্রকল্প এবং গন্ডার প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে যাতে সর্বোচ্চ মাত্রায় উল্লিখিত প্রাণীদের সুরক্ষা দেওয়া যায়।

এর সাথে রয়েছে ভারতের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন ১৯৭২। আইনটি

এরপর 2 পাতায়

ডঃ কোভুর

ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুর (জন্ম-১০/০৪/১৮৯৮, কেরালা, তিরুভাল্লা) এবং তাঁর অনুগামীরা ঈশ্বর, অবতার ওঝাগুণিন, জ্যোতিষী, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত ধরণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

পিতা রেভাঃ কোভুর এইপে থোম্মা কাথথানার ছিলেন মালাবারের মার থোম্মা সিরিয়ান চার্চের ১ম ভিকার জেনারেল। গোঁড়া খ্রীষ্টান পরিবার। তিনি বাড়িতে সিরিয়ান খৃঃ সেমিনারি স্কুল স্থাপন করেন। পরে একটি জমি চার্চকে দান করেন। এই জমিতে স্কুলটি উঠে যায়। কোভুরের বাল্য শিক্ষা এই স্কুলেই। স্কুল জীবনে কোভুরের সহপাঠী ছিলেন তাঁর খুড়তুতো ভাই পাপ্পাচেন, কোভুরের পাশেই বসতেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর একবার ধর্মের ক্লাস হচ্ছিল। যাচিয়াস্ নামক একজন যীশুর যাওয়ার পথের পাশে একটি ডুমুর গাছে উঠে বসেছে যীশু দর্শণের জন্য। যীশু ডুমুর গাছটির কাছে এসে তাকে নামতে বলেন এবং আশীর্বাদ করেন। এতদূর পড়িয়ে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, যীশুখ্রীষ্ট কিভাবে জানতে পারলেন যে যাচিয়াস গাছের ওপর বসে আছে? পাপ্পাচেন কোভুরের কাছে উত্তর জানতে চাওয়ায় কোভুর চুপি চুপি জানালেন, যীশু যখন গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যাচিয়াস একটি ডুমুর তাঁর মাথায় ছুঁড়ে মরে, ফলে যীশু বুঝ তে পারেন যে গাছে কেউ বসে আছে। কেউ যখন উত্তর দিতে পারলনা, তখন পাপ্পাচেন সরল বিশ্বাসে কোভুরের বলে দেওয়া উত্তরটি বলে দিলেন। ধর্ম প্রাণ

এরপর 6 পাতায়

কৃত্রিম প্রজনন - বন্য প্রাণী

1 পাতার পর

যথেষ্টই কঠোর তা সত্ত্বেও এই আইনে যথেষ্টই আইনি ফাঁকও রয়েছে। যার সুযোগে চোরাচালানকারীরা আজও সক্রিয়।

আরও বেশি করে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এবং সংরক্ষণের ভাবনায় ভারত সরকার তৈরি করেছেন কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা সংস্থা। ভারতের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২কে ১৯৯২ সালে পরিমার্জিত করে এই সংস্থাটি তৈরি হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হল চিড়িয়াখানাগুলোতে যাতে ন্যূনতম নিয়ম মেনে বন্য জীব প্রাণীদের সুরক্ষা প্রদান, তাদের দেখ ভাল এবং নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায়। এই মুহূর্তে ভারতে ১৬৯টি সরকারী নথিভুক্ত চিড়িয়াখানা রয়েছে যার মধ্যে ৬২টি বেশ বড় মাপের।

সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা থেকেই সংকটগ্রস্থ প্রাণীদের কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা আবাসস্থলে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে প্রজাতির সংখ্যা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে ইদানিং। সারা দেশেই এই প্রজনন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা সংস্থার অধীনেই পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এমনই কিছু উল্লেখযোগ্য প্রজনন প্রকল্পগুলোর কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এশিয় সিংহ প্রকল্প ঃ— এশিয় সিংহ তীব্র ভাবে সংকটাপন্ন সিংহের একটি উপপ্রজাতি। এমনিতেই সারা পৃথিবীতে মাত্র এর দুটি উপপ্রজাতি পাওয়া যায় এর অপরটি রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে। গুজরাতের গির অরণ্যে একমাত্র এদের দেখা মেলে। গুজরাত বন বিভাগের এপ্রিল ২০০৫ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর সংখ্যা ৩৫৯টি। ৬০ এর দশকে এর সংখ্যাও দ্রুতহারে কমতে থাকায় গুজরাত সরকার এদের জন্য বন্য এবং চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রজননের ব্যবস্থা করে। আজ আনুমানিক ৮৪টি প্রজাতি দেশের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় এবং কিছু অন্যান্য দেশের চিড়িয়াখানায় রয়ে গেছে। সারা বিশ্বে সর্বসাকুল্যে এশিয় সিংহের সংখ্যা ৪৫০-৪৮০টির মত হবে এই মুহূর্তে।

সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও WWF এবং অন্যান্য বেসরকারী সংগঠনের প্রচেষ্টায় চেন্নাই চিড়িয়াখানা, আমেদাবাদ চিড়িয়াখানা, কানপুর চিড়িয়াখানা, বনবিহার জাতীয় উদ্যান, ভুপাল প্রভৃতিতে এদের প্রজননের বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। গুজরাতের জুনাগড় জেলার সক্করবাগ চিড়িয়াখানা থেকে ইতিমধ্যে ১৪টি (৬টি পুরুষ এবং ৮টি স্ত্রী) সিংহকে উপরিউক্ত চিড়িয়াখানাগুলোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে প্রজননের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে এখান থেকে আরও ১৯টি সিংহকে (৮টি পুরুষ এবং ১১টি স্ত্রী) বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মে, ১৯৯৫ থেকে শুরু করে অক্টোবর, ২০০৩ এর মধ্যে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া যায় এই পরিকল্পনার জেরে। এই সময়ে প্রায় ১৮৬টি নতুন সিংহ জন্ম লাভ করে দেশের বড় বড় ৯টি চিড়িয়াখানায়। তবে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পাওয়া যায় সক্করবাগ চিড়িয়াখানায়। এদের ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর হার প্রায় ২৫ শতাংশে এবং ৬ থেকে ১০ মাস পর্যন্ত ৬ থেকে ১০ শতাংশ। এর জন্য কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা সংস্থা এই চিড়িয়াখানাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করে। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের কুনো অভয়ারণ্যে এদের নতুন ভাবে বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে অনেকটা দ্বিতীয় গির জাতীয় উদ্যানের আদলে, যেখানে এরা প্রাকৃতিকভাবে বন্য অবস্থায় থাকতে পারে যদিও গুজরাত সরকার গুজরাতের সম্পদকে মধ্যপ্রদেশে নিয়ে যেতে দিতে রাজী নয়। বাকিটা ভবিষ্যতই বলবে।

কুমীর প্রকল্প ঃ— ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিখ্যাত FAO বিশেষজ্ঞ (কুমীর) ডঃ এইচ আর বাস্টার্ড এর নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে উড়িষ্যার সাতকোশিয়া গর্জ অভয়ারণ্যের টিকর পাড়ায় ভারতে প্রথমবারের মত কুমীর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

জাতি পুঞ্জের (UNO) UNDP United Nations Development Project (UNDP) প্রকল্পের আওতায় অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে Central Crocodile Breeding and Management Training Institute (CCBMTI) খোলা হয়। এখানে ৯ মাসের জন্য কুমীর সংরক্ষণ বিষয়ে বনকর্মচারীদের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। এই প্রকল্পের জেরেই নন্দনকানন জুলোজিক্যাল পার্কে একটি ঘড়িয়াল প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে যেখানে কৃত্রিমভাবে ঘড়িয়ালদের প্রজননের ব্যবস্থা করা আছে।

নন্দনকাননে ডঃ বাস্টার্ডের নির্দেশে একটি গভীর (৯ মিটার) এবং দীর্ঘ জলাশয় খনন করা হয় যাতে কম করে ১,৮০,০০০ লিটার জল ধরে। এখানে জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট চিড়িয়াখানা থেকে ঘড়িয়াল এনে দেশীয় ঘড়িয়ালের সাথে সঙ্করায়ণ ঘটানো হয় এবং সাফল্যও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আবদ্ধ কুমীর প্রজননের এটাই পৃথিবীর প্রথম ঘটনা।

আশির দশকের শুরুতে প্রথম ১৩টি জাতীয় অভয়ারণ্যে কুমীর প্রকল্প চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এই প্রকল্পটি করবট জাতীয় উদ্যান, দুধওয়া জাতীয় উদ্যান, সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যাঘ্র প্রকল্প যুক্ত বনাঞ্চলে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের কাজকর্ম একে একে ওড়িষা, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান আবদ্ধ প্রজনন প্রকল্প এটি।

তুষার চিতা প্রকল্প ঃ— তুষার চিতা অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারী এবং এরা পৃথিবীর সীমিত কয়েকটি স্থানে পাওয়া যায় এশিয়া মহাদেশের। তীব্র সংকটাপন্ন এই জীবটিকে সংরক্ষণের আওতায় এনে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলোজিক্যাল পার্কে ১৯৮৩ সলে প্রথম কৃত্রিম প্রজনন প্রকল্প চালু করা হয়। এই তুষার চিতাকে নিয়ে একটি মাষ্টার প্ল্যানও করা হয়। আন্তর্জাতিক তুষার চিতা ট্রাস্ট এর কর্ণধার হেলেন ফ্রিম্যান এর তত্বাবধানে এর পথ চলা। ১৯৮৬ সালের মার্চে জুরিখ চিড়িয়াখানা থেকে একজোড়া এবং ১৯৮৯ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকান চিড়িয়াখানা থেকে আর এক জোড়া তুষার চিতা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়। এছাড়া ২০০০ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আরও দুটি তুষার চিতা এনে এই প্রকল্প চালানো হয়। বিগত ২০ বছরে অন্তত ৪০টি শিশু তুষার চিতার জন্ম হয়েছে এখানে। বর্তমানে ১৮টি তুষার চিতা রয়েছে এখানে— যা পৃথিবীর একমাত্র চিড়িয়াখানা যেখানে এককভাবে একসাথে এত বেশী তুষার চিতা রয়েছে। এখানকার মতই খুব সম্প্রতি সিমলা, গ্যাংটক এবং নৈনিতালেও একই রকম প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

রেড পান্ডা প্রকল্প ঃ— রেড পান্ডা পৃথিবীর অন্যতম বিপদগ্রস্ত প্রাণী যারা অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে (এমনিতেও বহু জায়গায় এরা এখন অবলুপ্ত)। এদের সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখেই ১৯৮৯ সালে 'গ্লোবাল ক্যাপটিভ ব্রিডিং মাষ্টার প্ল্যান' গ্রহণ করা হয় দার্জিলিং এর পদ্মজা নাইডু জুয়োলজিক্যাল পার্কে। প্রকল্পের শুরুতে একটি পুরুষ ও তিনটি মহিলা রেড পান্ডা নিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া চালানো হয়। পরবর্তীকালে বিখ্যাত রটারডার্ম চিড়িয়াখানা থেকে ১৯৯৩ সালে আরও একটি পুরুষ রেড পান্ডা আনা হয় বেশি সাফল্য লাভের আশায়। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম সফলতা

এরপর 3 পাতায়

কৃত্রিম প্রজনন - বন্য প্রাণী

2 পাতার পর

পাওয়া ১৯৯৪ সালে যখন দুটো শিশু রেড পান্ডা জন্মগ্রহণ করে। ঐ বছরই ইউরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানা থেকে আরও দুটো রেড পান্ডা এখানে আনা হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে আরও নতুন তিনটি রেড পান্ডা এখানে আনা হয় বহির্বিশ্ব থেকে। একই সাথে গ্যাংটকের চিড়িয়াখানায় আরও একটি রেড পান্ডা প্রজনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এক জোড়া রেড পান্ডাদের নিয়ে। বিগত ১০ বছরে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় অন্ততঃ ৪০টি নতুন শিশু পান্ডার জন্মের খবর আছে। খুব সম্প্রতি গ্যাংটক, সিকিম চিড়িয়াখানায় নতুন শিশু রেড পান্ড জন্ম নিয়েছে সাফল্যের সাথে। এরই মধ্যে নতুন কিছু বুনো পরিবেশ থেকে সংগৃহীত রেড পান্ডা ও এই দুটি চিড়িয়াখানায় যোগ করা হয়েছে।

এছাড়া সিংগালিলা জাতীয় উদ্যান দার্জিলিং এর গৈরিবাসেও অনুরূপ আবদ্ধ প্রজনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ডঃ সুনীতা প্রধানের নেতৃত্বে।

শকুন প্রকল্প ঃ— নব্বইয়ের দশকে (১৯৯০ সালে) খবরে প্রকাশিত হয় যে ভারতের তিনটে প্রধান জাতের শকুন যথা Indian White Backed Vulture *(Gyps bengalensis)* Long Billed *(Gyps indicus)* এবং Slendet Billed Vulture *(Gyps tenuirostris)* শতকরা ৯০ ভাগ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক আকারে কেবলমাত্র শকুনের বংশ লোপ পেয়েছে রাজস্থানে। এও জানা যায় ভারতের এশিয়া বিখ্যাত বেসরকারী সংস্থা Bombay Natural History Society (BNHS) ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে - এর কারণ এবং সম্ভব্য প্রতিরোধ করার বিষয়ে। এই সেমিনারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে আগামী দিনে প্রথম পর্যায়ে একটি Vulture Care Centre খোলা হবে। কথা মতো ঐ বছরই হরিয়ানা সরকারের সহযোগিতায়, হরিয়ানার পিঞ্জোরে ভারতের প্রথম উদ্ধার কেন্দ্র এবং কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কাজে এগিয়ে আসে সারা বিশ্বের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা যেমন Birdlife International Partnet, The Royal Society for the Protection of Bird, U.K. The London Zoological Society প্রভৃতি।

বর্তমানে জানা গেছে যে, মূলত ডাইক্লোফেনাক নামক ব্যাথা উপশমকারী ঔষুধের বিষক্রিয়ায় এরা মারা যাচ্ছে। এই ব্যাথা উপশমকারী ঔষুধটি ব্যাপক আকারে আজকাল গৃহপালিত পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ঔষুধটি সহজ লভ্য এবং সস্তায় পাওয়া যায় বলে, পশু চিকিৎসকরা ব্যাপক আকারে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ঔষুধ ব্যবহারের পরও ঐ পশুটি মারা গেলে, মৃত দেহে ঔষুধের বিষক্রিয়ার শিকার হয় এই শকুনের। বহু বিতর্কের পর শেষ মেষ জনগনের চাপে ভারত সরকার উক্ত ঔষুধটি গত ২০০৭ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এছাড়া আরও কিছু সংস্থা (যেমন ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রক National Birds of Prey Trust, U.K. প্রভৃতি) এবং Poultry Diagonostic and Research Centre, Pune এর সহযোগিতায় দেশ জুড়ে কিছু চিহ্নিত স্থানে এদের কৃত্রিম প্রজনন স্থল তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্র ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, অন্ততঃ ১০০টি জোড়া শকুনকে আগামী ১৫ বছরে প্রকৃতিতে ছাড়া হবে। ভারত সরকারের Central Zoo Authority বেশ কিছু চিড়িয়াখানা যেমন ভূপাল, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড় এ এদের আরও কৃত্রিম প্রজনন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

সারা উত্তর পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজা ভাত খাওয়া নামক বনাঞ্চলে একই রকম শুশ্রুষা কেন্দ্র এবং প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে ভবিষ্যতে 'In-Situ Conservation' হিসেবে আবদ্ধ প্রজনন বা 'Captive Breding' পরিকল্পনা সংরক্ষণের জগতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ— Science Reportet, Feb, 2008

— লেখক রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব। মোঃ- ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ

5 পাতার পর

প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুভগ্রহ-নক্ষত্র, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, নল-ঢালা, বশীকরণ ইত্যাদি যতরকম আদি-যুগের মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, তা মানুষের মন থেকে দূর করে দিতে না পারলে, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন, কখনই সম্ভব নয়।

একমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারাই এইসব ব্যাধিকে সরানো সম্ভব। আমাদের দেশে সাক্ষর তা অভিযান চালিয়ে মানুষকে শুধু নাম সই করা এবং একটু আধটু পড়তে শিখিয়ে দিলেই, তার সার্বিক চেতনা জাগিয়ে দেওয়া হয় না। পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার প্রতি আত্মসচেতন করিয়ে দেওয়াও একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার। এইসব কাজে গ্রামীন বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের অনায়াসে লাগানো যায় এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরকারীভাবে সরবরাহ করা যায়।

বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রামীন অঞ্চলকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার সম্ভাবনা কোন বিরাট আকাশকুসুম পরিকল্পনা নয়। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রয়োগবিদ্যা এবং তার যথাযথ ব্যবহার গ্রামীন পরিবেশের শ্রীবৃদ্ধি করবেই যদি রাজনৈতিক অপপ্রয়োগ এবং মানুষকে শোষণ করার ঘৃন্য ইচ্ছাতে ইচ্ছাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞান সেই তো একশো বছর আগে 'বিজলীবাতির' সম্মান দিয়েছে। কিন্তু সুদূর গ্রামাঞ্চলে মানুষের কাছে বিজলীবাতি কল্পনারই থাকবে। এমনকী যে কেরোসিনের আলো দিয়ে, স্বল্পালোকে চোখ খারাপ করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে, আজকের ভয়াবহ পেট্রোলজাত পদার্থের কৃত্রিম অভাবের জন্য, তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিকল্প কেবলমাত্র বিজ্ঞানই করতে পারে। বিকল্প শক্তি আহরণ এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞান কতকগুলি পদ্ধতি বহু আগেই বাতলে দিয়েছে। তার প্রয়োগে এত দেরী হচ্ছে, তার জন্য দায়ী কিন্তু বিজ্ঞানীরা নয়, দায়ী আমাদের দেশের কর্ণধারগণ-যাঁরা সভায় ভাষণ দিয়ে ক্ষান্ত হন।

লেখক ঃ কাননকুমার প্রামানিক, নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর। চলভাষ ঃ ৯৪৩৪৩৬৯৬৬১

মৌলির অভিজ্ঞতা

1 পাতার পর

প্রঃ-গ্রামের মানুষ বলে অমাবস্যায় আর পূর্ণিমায় নাকি চাকে বেশি মধু থাকে।

উঃ-একদম বাজে কথা। এই ধারনা একদম ভুল। ফুলের সংখ্যা অনুযায়ী মধু পাওয়া যাবে। গ্রীষ্মকালে অনেক সময় ঠান্ডা আবহাওয়া হয় তখন মধু কম হয়। তাই জোয়ার ভাঁটা বা অমাবস্যা, পূর্ণিমায় মধু বেশি হবে এই ধারণা ঠিক নয়।

প্রঃ-মধুর কি কোনো সিজন আছে যে এই সময় মধু বেশি পাওয়া যাবে।

উঃ- সাধারণত চৈত্র মাস থেকে আষাঢ় মাস মধু বেশি পাওয়ার সময়। এই সময় চাক ভর্তি মধু থাকে। গরমের সময়ই মধুর প্রকৃত সময়।

প্রঃ-কি কি ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে?

উঃ-নিমের মধু, তিলের মধু, সরিষার মধু, ভাঁটফুলের মধু (এই মধু লাল রঙের হয়), সুন্দরবনে সুন্দরি ও গরান গাছের মধু, আম, লিচুর মধু, তেঁতুল ফুলের মধু, মেস্তা ফুলের মধু, সজনে ফুলের মধু, খেজুরের রসের নির্যাসও সংগ্রহ করে মৌমাছিরা। মহুয়ার মধুও খুব সুন্দর কিন্তু অনেক মৌ চাষীগন বলেন এটা লিচুর, এটা গরান, এটা নিমের মধু - এই কথাটিও সঠিক নয়। আম বাগানের পাশের মিষ্টির দোকান থাকলেও সেখান থেকে রসগোল্লার শিরাও সংগ্রহ করে মৌমাছিরা। মধু হল মৌমাছির বমি। তাই এই উদ্গীরণই আমাদের কাছেই মূল্যবান বস্তু।

প্রঃ-বর্ষায় মধু কি পাতলা হয়?

উঃ- একদম ভুল ধারণা। এই সময় মৌমাছি প্রতিটি গর্তের মুখ মোম দিয়ে ঢেকে দেয় যাতে চাকে জল ঢুকতে না পারে। তবে এই সময় ফুলের ওপর তো খানিক জল থাকে তাই খানিকটা জলীয় ভাব মধুতে থাকলেও থাকতে পারে।

প্রঃ- তোমরা যে ভাবে চাক ভাঙ তাতে মধুর সাথে মোম মিশে যায় তা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে?

উঃ- একটু আধটু মোম মিশলে খুব একটা অসুবিধা নেই। কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

প্রঃ- মৌমাছিরা খুব পরিশ্রমী হয় এই রকম শুনেছি।

উঃ-কথাটা ঠিক তবে অলসও। শীতকালে সকাল ১০টার আগে ঘুম ভাঙে না। কিন্তু চাকের ২ কিমি অঞ্চলে ঘুরে ওরা মধু সংগ্রহ করে ওরা চাকে জমা করে।

প্রঃ- তোমাদের যে মৌমাছি তার সাথে কাঠের বাক্সের মৌমাছির কী পার্থক্য?

উঃ-আমাদের ডাঁস মাছি বা বড় মাছি। ওদের মাছি আকারে ছোটো এবং আমাদের মাছির চেয়ে একদম দুর্বল। আসলে ওরা তো চিনি গোলা জল খায় আর আমাদের মাছি ফুলের মধু খেয়ে থাকে।

আর ভাই সময় নেই এইবার মুকুন্দনগর চাক ভাঙতে যেতে হবে। তবে এইসব জেনে তুমি কী করবে যদি কোনো কাগজে লেখ তবে লেখ আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় মধু কমে যাচ্ছে তাই জীবিকাতেও টান পড়েছে আমাদের। আগে মাসে ১০ থেকে ১৫ কেজি মধু পেতাম এখন তা ৬-৭ কেজিতে ঠেকেছে। তাই হয়তো বা রিক্সা-ভ্যান চালাতে হবে এই কাজের সাথে। পরিবেশের খারাপ অবস্থার সাথে মানুষের জীবন-জীবিকারও কী ধরণের পরিবর্তন ঘটছে তা ওর সাথে কথা বলে উপলব্ধির মধ্যে আনলাম। ফলের গাছ কেটে অর্থকরী গাছ (মেহগনি, ইউক্যালিপটাস, শোভাফুল, লম্বু) লাগাবার ফলে মধু কমছে পৃথিবীতে।

— লেখক ঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

রসায়নে আইজি নোবেল পেল 'অসেদ্ধ ডিম'

এমন একটি যন্ত্র নাকি সেদ্ধ ডিমকে অসেদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারে। একদল অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী এই আবিষ্কারের জন্য এবছর আইজি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আইজি নোবেল প্রাইজকে একরকম ভাবে আসল নোবেল প্রাইজের প্যারোডি বলা যেতে পারে। যাদের অফিসিয়াল লোগো বিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রাঁদার সৃষ্টি "দ্য থিঙ্কার" এর অনুকরণে তৈরী একটি শোয়ানো চিত্র। যেখানে থিঙ্কার যেন পা উঁচিয়ে শুয়ে গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। প্রতি বছর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে অ্যানালস্ অফ ইমপ্রোবাবল রিসার্চ নামক পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ডার্স থিয়েটারে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার দশটি তুচ্ছ এবং হাস্যকর বা অস্বাভাবিক কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়।

ফ্লিন্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কলিন র‍্যাসটনের নেতৃত্বে তারা Vortex Fluid Device (VFD) তৈরী করেছেন যা তীব্র ঘুর্ণনের মাধ্যমে প্রোটিনের গঠন পাল্টে দিতে পারে। এবছরের শুরুর দিকে একদল বিজ্ঞানীর সামনে এরা সেদ্ধ ডিমের শক্ত সাদা অংশ নিয়ে দেখিয়েছেন যে ঘুর্ণনের ফলে সৃষ্ট সত্যিই স্বাভাবিক গুণভ্রষ্ট প্রোটিনকে রিফোল্ড করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারে।

পুরস্কার নিতে গিয়ে র‍্যাসটন বলেছেন "প্রত্যেক বিজ্ঞানীই চান তার আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাজ ও সভ্যতার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যেতে, তবে কারো কারো ক্ষেত্রে তা সত্যিই ঘটে।" বিজ্ঞানী দলের আশা তাদের এই আবিষ্কার রান্নাঘরে নয় বরং বায়োমেডিক্যাল রিসার্চে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। VFD হয়তো ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়াকলাপে সৃষ্ট Misfoled প্রোটিন গুলোকে (যা হয়তো জীবদেহে কোনো জটিল অসুখের জন্য দায়ী) আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে। আমরাও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম এই নতুন পদ্ধতির সফল প্রয়োগের দিকে। আশার কথা, এই পদ্ধতি প্রয়োগের সাফল্য হিসাবে খুব সম্প্রতি এক বিশেষ ধরণের ক্যান্সার ড্রাগের কার্যকারিতা প্রায় চারগুন বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে।

লেখক ঃ ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাই স্কুল, ফোন ঃ- ৯৪৩৪৩৭৭০৬৭, Email : acnbu13@gmail.com

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই মানুষ যখন পরস্পরের সহযোগিতায় বসবাস করতে লাগল মানে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ জীবনযাপন আরম্ভ করল সেই সময় থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ অন্যান্যদের উপর বুদ্ধির দ্বারা নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখে পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করল। ফলে সেদিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্ণ বৈষম্য, পৌরহিত্যবাদ যা আজকের মৌলবাদ। এসবের পিছনে আছে কুসংস্কার, অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি।

আজ সভ্যসমাজে সৃষ্টি হয়েছে নানা বৈষম্য। বৈষম্যের ঝাঁপি খুললে দেখা যায় ধর্মভেদ, জাতিভেদ (সম্প্রদায়), পুরুষ-মহিলা ভেদ, পুত্র-কন্যা সন্তানভেদ, গায়ের রং ভেদ ইত্যাদি। এছাড়া আছে গ্রাম-শহর ও অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার বৈষম্য।

লিঙ্গভেদে জন্ম নিয়ে এই মানবসমাজ এক সমস্যায়। এ বৈষম্যের ফলে কন্যা সন্তান প্রাচীনকাল থেকে অবহেলিত। পুত্র-সন্তানরা খাদ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা শিক্ষা ও সমাদর পরিবারে যতটা পায় কন্যা সন্তান তার তুলনায় অনেক কম পায়। বর্তমান দিনে কিছুটা পরিবর্তন হলেও তা কতজনের পরিবারে? যেখানে গ্রামে গঞ্জে শিশুরা 40% অপুষ্টিতে ভুগছে।

সেখানে পুত্র-কন্যার অনুপাতে 15:25 মোটামুটি দেখা যায়। আমাদের পুরানে উল্লেখ আছে, অতীতে কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায় জন্মাবার পরেই তাদের অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তানকে হত্যা করত। সারা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের মত অগ্রসর রাজ্যেও কন্যা সন্তান হত্যা চলেছে এবং চলেছে মায়েদের উপর জন্ম দেওয়ার জন্য অত্যাচার। মায়েরা অত্যাচারিতার ফলে কখনও কখনও কন্যা সন্তান হত্যা করে নিজেই আত্মঘাতী হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অজ্ঞতা হেতু কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পেছনে বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ জানতে পারলে জন্মদাতা মার উপর আর দোষ দেবে না বা কন্যাভ্রুন হত্যা বন্ধ হবে।

সন্তান ভ্রুন সৃষ্টি হয় মেয়েদের জরায়ুতে শুক্রকীট ও ডিম্বকোষ মিলনের ফলে। মানুষের শরীরে প্রতিটি কোষ এক জোড়া প্রজনন সংক্রান্ত ক্রোমোজোম বা লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম থাকে। হ্রাস বিভাজনে শুক্রকীটে থাকে XY ক্রোমোজোম আর ডিম্বকোষে থাকে XX ক্রোমোজোম। শুক্রকীটের X ক্রোমোজোম যদি নিষেকের সময় ডিম্বকোষের যে কোন একটি X ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলন ঘটে তাহলে সন্তান হবে কন্যা আর যদি শুক্রকীটে Y ক্রোমোজোম ডিম্ব কোষের X ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলন ঘটে তবে পুত্র সন্তান হবে। এখানে উল্লেখ্য জননকোষের হ্রাস বিভাজন হওয়ার পর XX বা XY ক্রোমোজোম পৃথক হয়। Y ক্রোমোজোম পুত্র সন্তান সৃষ্টির জন্য দায়ী যা থাকে পুরুষের শুক্রকীটে আর দোষারাপ করে স্ত্রীদের। এ নিয়ে সকলকে অবহিত করতে হবে পুত্র সন্তান XY ও কন্যাসন্তান XX মিলনের ফলে তৈরী হয়।

সমাজে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে বিজ্ঞানই পারে বৈষম্য দূর করতে। সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থায় গায়ের রং নিয়ে এক সমস্যা। ফর্সা বা কালো রং নিয়ে পছন্দ/অপছন্দ লেগেই আছে। গায়ের এই রং এর জন্য দায়ী শরীরে এক রঞ্জক পদার্থ যা হল মেলানিন। এই মেলানিন এর ঘনত্ব চর্মে (ত্বকে) বেশী হলে কালো এবং কম হলে ফর্সা। এই বৈষম্য জিন ঘটিত কারণে।

অর্থনৈতিক অসাম্য কী শহরে, কী গ্রামে। তার উপর খাদ্যশস্যের অসম বন্টনে এক শ্রেণীর মানুষ যেমন প্রচুর খায়, প্রচুর নষ্ট করে। তেমনি আর অন্য শ্রেণীর মানুষ আধা পেট বা না খেয়ে দিন কাটায়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এ বৈষম্য প্রকট। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করে সঠিক পরিসংখ্যান মাধ্যমে তার সমাধান করতে হবে।

নাগরিক জীবন-ধারা এই একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক পাল্টে গেছে কিন্তু সেই হারে গ্রামীন জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন আসেনি। শ্রমকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য যে সব পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে তা বড় শহরের কাছাকাছি কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে সংখ্যায় তা মুষ্ঠিমেয়। আমদানী করা পাশ্চাত্য টেকনোলজি দিয়ে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সাধনের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয় এবং তা দিয়ে মহৎ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। দেশকে আধুনিকভাবে সাজাতে গিয়ে যে সব বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে, তার সাহায্যে দেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে তা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি।

গ্রামকে, গ্রামের মতোই না রেখে তার স্থান থেকে বিচ্যুত আর গ্রামোন্নয়ন হয় না। বাইরের থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা গ্রামের মধ্যে রপ্তানি করে দিলেই তার সার্বিক উন্নয়ন হবে না। দুই-তিন যুগ আগে গ্রামীন উন্নয়ন সম্পর্কে E.F. Schumacher (Small is beautiful) যা বলে গেছেন, তা আজও আমাদের দেশের গ্রামীন উন্নয়নের পক্ষে কার্যকরী।

ক) গ্রামীন উন্নয়নের কার্যশালা প্রধানত সেইসব স্থানে করতে হবে যেখানে লোক বসবাস করছে বহুদিন থেকে। এই জায়গাগুলো হবে শহর থেকে দূরে।

খ) কার্যশালায় আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সস্তা হওয়া দরকার। তার জন্য ব্যাপক পরিমানের অর্থ যেন না লাগে।

গ) গ্রামের প্রয়োজনীয় যে সব জিনিস প্রস্তুত হবে, তার উৎপাদন পদ্ধতি সরল হওয়া দরকার এবং তার জন্য খুব উচ্চধরণের কলাকৌশল যেন প্রয়োজন না হয়।

ঙ) উৎপাদিত দ্রব্য, সেই গ্রামের মানুষের প্রয়োজনেই যেন কাজে লাগানো হয় এবং মুনাফা অর্জনে যেন অসাধুরা যাতে হস্তক্ষেপ না করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

গ্রামের প্রকৃত উন্নয়ন করতে গেলে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর দৃষ্টি রেখেই এগোতে হবে। সেখানের মূল সমস্যাগুলো অধ্যয়ন, তার শ্রেণীবিন্যাস এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই কাজের জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক লোকের প্রয়োজন। আমাদের দেশে গ্রামীন অঞ্চলগুলিতে বিশেষভাবে অনুন্নত জায়গায় যে সব গ্রাম রয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু নাই। কুসংস্কার, কুপ্রথা এমনভাবে শেকড় বিস্তার করে আছে সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচার করা

এরপর 3 পাতায়

স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার

২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য - ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষও স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু পাশের শ্রীলঙ্কাও তার দেশের নাগরিকদের বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য-পরিষেবা দিচ্ছে আর আমরা পাচ্ছি লবডঙ্কা। শুধু চিকিৎসা খরচ মেটাতে প্রতি বছর ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাচ্ছেন। হাসপাতালে বেড পাওয়ার সুপারিশের জন্য নেতা মন্ত্রীর পায়ে মাথা খুঁড়তে হয় অথবা দালালকে টাকা দিতে হয়। এই তো হাল!

অথচ সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা যাকে বলে সবর্জনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা তা লাগু করা গেলে এই অবস্থা বদলানো যায়। অন্তত ৪১টা দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে। ধনী ইংল্যান্ড থেকে গরীব পেরুও আছে এই দলে। কিন্তু আমাদের সরকার ১৫ বছর ধরে শুধু কথার খেলাপই করে যাচ্ছে।

২০১১ সালে ভারত সরকারেরই নিয়োগ করা ডাঃ শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বে গড়া বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের দাবি —

১) সরকার তারই নিযুক্ত শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের সুপারিশ মেনে সব নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নিক।

২) রাজ্য সরকার বা তাদের নিযুক্ত সংস্থার সকল চিকিৎসা-কেন্দ্র থেকে প্রতিশ্রুত সব রকমের চিকিৎসা পরিষেবা সকল নাগরিককে বিনামূল্যে দেওয়া হোক।

৩) বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ দিতে হবে।

৪) স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যে একটি পয়সাও নেওয়া চলবে না।

৫) স্বাস্থ্যবিমা কোনো সমাধান নয়। এটা চিকিৎসাকে ব্যবসায়ে পরিণত করে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত করে।

৬) সরকারের নতুন প্রস্তাব মতো ESI Scheme কে কারখানার শ্রমিকদের জন্য অপশনাল করে দেওয়া যাবে না, বরং সরকার ও মালিকদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে।

শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন আরও বলেছিল বড়োলোক থেকে গরিব সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হলে ২০১৭ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়িয়ে আভ্যন্তরীন উৎপাদনের ২. ৫ শতাংশ করতে হবে। তখন কংগ্রেস সরকার তা মানেনি আর ''আচ্ছে দিন আনেওয়ালা'' মোদী সরকার এসেই স্বাস্থ্য খাতে বাজেট ৫০০০ কোটি টাকা কমিয়েছে। অথচ বড়ো বড়ো কোম্পানিকে বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দিচ্ছে।

অমর্ত্য সেনের মতো বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদসহ অনেকেই অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছেন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্ভব। কিন্তু গদিতে বসে কোনো সরকারই সে কথা শুনছে না। তাই কালা সরকারের কানে পৌঁছানোর জন্যে আসুন সকলে মিলে জোর আওয়াজ তুলি - 'স্বাস্থ্য কোনো ভিক্ষা নয়। স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার।'

৩২টি বিজ্ঞান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে ডাঃ পূণ্যব্রত গুণ স্বাস্থ্য প্রচার কমিটির এইচ এ-৪৪ সল্টলেক কল-৯৭ কর্তৃক প্রচারিত।

ডঃ কোভুর

1 পাতার পর

শিক্ষকমশাই রেগে অগ্নিশর্মা, মার খেতে খেতে পাপ্পাচেন জানালেন উত্তরটি আসলে কোভুরের বলে দেওয়া। কেভুরেরও শাস্তি হল। প্রত্যাশিত উত্তরটি ছিল, যীশু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যাচিয়াসকে দেখতে পেয়েছিলেন (!) দঃ ভারতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্য প্রথা প্রবল ছিল। ছোটবেলায় একবার কোভুর তাঁদের চাকর কুনহিরামনকে নিয়ে দূরে যাচ্ছিলেন। কুনহিরামনরা ছিল 'নীচু জাত' —এঝাভা। গন্তব্য স্থানে যেতে ফেরি নৌকা করে একটি নদী পেরুতে হত। নদীর ধারে গিয়ে দেখলেন একজন বয়স্ক নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণও ওপারে যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত। একটাই নৌকা ছিল আর চড়ার পর যাত্রীকেই পাড়ে লগি ঠেলে যাত্রা করতে হত। নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ কায়দাটা জানতেন না। তাই তিনি কেভুরকে অনুরোধ করেন শুধুতাঁকেই ওপারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে, তারপর কুনহিরামনকে নিয়ে যেতে—তা না হলে একই নৌকায় কুনহিরামনের সঙ্গে তাঁকে চাপতে হবে। প্রথমে ব্রাহ্মণ চাপলেন, তারপর রাগ চেপে কোভুর উঠলেন এবং কুনহিরামনকে নৌকায় উঠতে বললেন। ও একটুইতস্তত: করছিল, কোভুর ওকে টেনে নৌকায় তুললেন। কিন্তু কুনহিরামন নৌকাটি ছুঁয়ে ফেলার পূর্বমুহূর্তে ব্রাহ্মণ চিৎকার করে জলে ঝাঁপ দিলেন। পাড়ের কাছেই নদীটি গভীর থাকায় ডুবে যাবার অবস্থা হল। কোভুরের নির্দেশে দক্ষ সাঁতারু কুনহিরামন ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করল। এবার কোভুর কুনহিরামন ও ব্রাহ্মণকে নিয়ে একই নৌকায় ওপারে গেলেন। তামাশা দেখতে জড়ো হওয়া লোকেদের শুনিয়ে কেভুর ব্রাহ্মণকে বললেন ''ছোঁয়া বাঁচাতে আরেকবার স্নান করবেন না তো?''

ছোটবেলায় কোভুর একবার তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়িতে এক সপ্তাহ ছিলেন। একদিন রাতে কোভুরের প্রচন্ড কাশি হওয়াতে দিদি তাঁকে কবিরাজের দেওয়া ওষুধ মধু-র সঙ্গে খেতে দিয়ে বলেন, খাওয়ার সময় যীশুখ্রীষ্টের নাম নিতে। কোভুর বলেন, ওষুধটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যীশুর নাম নিলে কোন্‌টির জন্য কাজ হচ্ছে তা তো বোঝা যাবে না; তার চেয়ে বরং আগে ওষুধ খাওয়া যাক, ওতে কাজ না হলে যীশুর নাম নেওয়া যাবে। সখেদে দিদি বলেন, ''আফশোষের কথা যে আমাদের ধর্মপ্রাণ বাবা তোমার মত নাস্তিক ছেলে পেয়েছেন।''

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে কোভুর ছোট ভাই বেহানান কেভুরের কাছে, উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন। বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হয়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। কর্মজীবনে ডঃ কোভুর প্রথমে কেরালার কোট্টায়ামে সিএমএস কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক হিসাবে দুবছর কাজ করেন। একবার উটি-তে গিয়েছিলেন পাহাড়ী গাছপালার নমুনা সংগ্রহে। ওখানে একই উদ্দেশ্যে আসা রেভাঃ পি টি ক্যাশ এর সাথে তাঁর আলাপ হয়। ক্যাশ ছিলেন শ্রীলঙ্কায় মেথডিষ্ট মিশন পরিচালিত জাফনা সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ। সেখানে যোগদানের আমন্ত্রণে ডঃ কোভুর ১৯২৮ সালে জাফনা সেন্ট্রাল কলেজে যোগ দেন। ১ম বছর ডঃ কোভুরকে উদ্ভিদ বিদ্যা ছাড়া, ধর্ম বিষয়েও পড়াতে বলা হয়েছিল। ফাইনাল পরীক্ষার ফল বেরুতে দেখা গেল সব ছাত্রই এই বিষয়ে ভাল ফল করেছে। কিন্তু পরের বছর তাঁকে বিষয়টি পড়াতে দেওয়া হল না। বিস্মিত ডঃ কোভুর কারণ জানতে চাইলে রেভাঃ ক্যাশ হেসে বলেন, ''এটি ঠিকই যে আপনি ধর্ম বিষয়ে অভূতপূর্ব ফল দেখিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার সব ছাত্রই বাইবেলে বিশ্বাস হারিয়েছে।''

বড়দিনের ছুটির পর কলেজ খোলার আগে একদিন কলেজের সকল অধ্যাপক-কর্মচারীদের নিয়ে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সে বছর বেশ খরা চলছিল, রেভাঃ ক্যাশ তাঁর বক্তৃতায় বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও জানালেন। পরে একসাথে বসে খাওয়ার সময়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার পেছনে কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এই বিষয়টি ডঃ কোভুর রেভাঃ ক্যাশ-এর কাছে জানতে চাইলেন। রেভাঃ ক্যাশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে কোভুরকে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর ডঃ কোভুর জানতে চাইলেন, রেভাঃ ক্যাশ বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করলেন, সেটি কলম্বো অবজারভেটরি আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষণা করার সময় গণ্য করবে কিনা! ক্যাশ হেসে উত্তর দিলেন, ''আব্রাহাম, আপনি আমায় বেশ ফাঁদে ফেলেছেন। আসুন আমরা ওসব কথা ভুলে আরাম করে খাই।'' (সংক্ষিপ্ত এবং লেখসূত্র - ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর ঃ ভবানী প্রসাদ সাহু, দীপ প্রকাশন, ৪র্থ সং, কলকাতা)।

লেখক ঃ তপন চন্দ, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার, মোঃ-৯৭৩৩১৫৩৬৬১

সাপের ও বিষের প্রয়োজনীয়তা

সাপ বললেই সাধারণ মানুষের চোখে একটা ভয়ার্ত চিত্র ফুটে ওঠে। রাত্রিবেলায় সাপের কথা শুনলে অনেকে মনে মনে আস্তিকমুনির নাম স্মরণ করেন। সাধারণ মানুষের এই অহেতুক ভয় নিবারণে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস। বাস্তুতন্ত্র তথা Ecology র ভারসাম্য যাতে একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় তাই আমাদের সকলেরই প্রয়োজন সাপ সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য জেনে রাখা, আমাদের সাপ চেনা দরকার। না হলে শুধুমাত্র ভয়ে মানুষ তার সাপ নিধন চালিয়ে যাবে এবং এমন সময় আসবে যখন শুধুমাত্র ইঁদুর নিধনের জন্য কৃত্রিম পদ্ধতি অথবা লোক নিয়োগ করতে হবে। একটা মেঠো ইঁদুর বছরে প্রায় ১ কুইন্টল খাদ্য শস্য নষ্ট করে। আবার একটা সাপ (বিশেষ করে দাঁড়াশ, গোখরো এবং কেউটে) গড়ে প্রতি বছর ১০০টির বেশী ইঁদুরকে তাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। ঠান্ডা মাথায় হিসাব কষলে ধারণা পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সর্পকূল আমাদের কৃষিভিত্তিক দেশের কৃষকদের কত বড় বন্ধু।

সাপের বিষ থেকে এমন অনেক ঔষধ তৈরি হয় যা মুমূর্ষু রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। সুতরাং যে বিষ মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে পারে তাই আবার প্রাণসঞ্চয়ও করতে পারে। সাপের বিষ থেকে তৈরি ওষুধ মানুষের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার কাজে লাগে, ষ্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তির Blood Clot স্বাভাবিক করার জন্য সাপের বিষ থেকে প্রস্তুত ওষুধ লাগে, কোবরা জাতীয় সাপের বিষের এক প্রকার এনজাইম মানব শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের দুটি রোগ (Parkinson's disease & Alzheimer's Disease) এর একেবারে নিরাময়কারী ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরণের Cancer বা কর্কট রোগের নিরাময়কারী ঔষধে সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়। যেমন Copperhead সাপের বিষে উপস্থিত কিছু engyme, breast cancer নিরাময় করে।

ত্বক কুঞ্চন মুক্ত করতে বর্তমান বিজ্ঞানে তথা medical science এমন কিছু ক্রীম জাতীয় ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে সাপের বিষ বর্তমান।

সত্যি বলতে সাপের বিষ যে মানবজীবনে কতটা কার্যকরী তা ১৯৭০ সালের এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছিল। যা থেকে প্রথম সাপের বিষের প্রোটিনকে ব্যবহার করে রক্তচাপ কমানোর ঔষধ প্রস্তুত হয়েছিল।

গেভিন হাটলে, একজন বিজ্ঞানী (অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) বলেছিলেন যে সাপের বিষ গ্রন্থি আসলে একটা বিশাল ঔষধের কারখানা, যা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব, এবং পরীক্ষার ফলস্বরূপ যে তথ্য আমরা পাই তা মানবকল্যাণে সমর্থ।

মায়ামীর বিল হাস্ট ১০১ বছর বেঁচে ছিলেন সুস্থ ভাবে, তার এতদিন বেঁচে থাকার মূলে ছিল সাপের বিষ, হ্যাঁ তিনি প্রায় প্রতিদিনই ইনজেকশনের মাধ্যমে নিজের দেহে অল্প মাত্রায় সাপের বিষ ঢুকিয়ে দিতেন। বৈজ্ঞানিকদের মতে তিনি Vaccinology র সবচেয়ে পুরাতন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

Michael নামে এক ব্যক্তি অস্থি সংক্রান্ত রোগ Ankylosing Spondylitis রোগে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন, রোগটি একধরণে Spinal Arthritis। কিন্তু ছুটি কাটাতে গিয়ে তাঁকে কোন এক সাপে কামড়ায় এবং ধীরে ধীরে তিনি প্রায় সুস্থ হতে শুরু করেন। বছর দুই পরে উনি একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এরিসটোস্ট্যানিন নামে একটি Protein, যা Asian Sand Viper এর বিষে উপস্থিত - তা মানুষের দেহে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে।

Hannalgesin নামে একটা ঔষধ যা প্রধানত Kingcobra বিষ থেকে প্রস্তুত করা হয় - যা ব্যাথা বেদনা উপশমকারী Morphine এর থেকে ২০০ গুন বেশী কার্যকরী এবং যা আমরা অনন্য ওষুধের মত গিলে খেতে পারি।

নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হওয়া World Homeopathy Summit এ বিজ্ঞানী ও গবেষকরা দাবী করেছেন যে Rattle Snake এর বিষ থেকে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথি ওষুধ মানব শরীরে HIV র প্রসার বন্ধকরতে পারবে।

এছাড়াও সাপের বিষ থেকে সাপেরই বিষ রোধী সিরাম বা ASV তৈরি হয়— সুতরাং সাপকে বাঁচানোটা আমাদের কর্তব্য বলা চলে। সমগ্র যত ধরণের সাপ এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে ২৭২টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে সমগ্র পৃথিবীর 10% সাপ ভারতে উপস্থিত। এই ২৭২টা প্রজাতির মধ্যে বিষধর মাত্র ৬২টা প্রজাতি, ৪২টা প্রজাতি ক্ষীন বিষধর বাকি সব নির্বিষ। এই ৬২টা বিষধর প্রজাতির মধ্যে ২০টা সাপ শুধুমাত্র সমুদ্রতেই পাওয়া যায়, ৪২টা বিষধর সাপের মধ্যে প্রাণঘাতী (deadliest) ৪টে সাপ, তাদের একত্রে "Big four of India" বলা হয়। Big Four এর অন্তর্গত চারটি প্রজাতি হল চন্দ্রবোড়া (*Daboid russelli*), ফুর্সা (*Echis carinatus*), গোখরো (*Naja naja*) এবং কালাচ (*Bungarus caeruleus*), এদের ছাড়া সেরকম অর্থে বিপজ্জনক সাপ ভারতে নেই। সুতরাং অহেতুক সাপ নিধন করে বাস্তুতন্ত্রের গঠন আমরা শিথিল না করলেই ভালো।

সব শেষে বলা যে না চিনে, না জেনে শুধুমাত্র সাপ বলে সাপ মারা উচিত নয়। আত্মরক্ষা প্রত্যেক জীবের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান। সুতরাং সাপের আত্ম রক্ষার্থে ছোবল মারাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু মানুষ আত্মরক্ষার্থে একেবারে মৃত্যুর দরজায় সাপকে ঠেলে দিচ্ছেন - এটা মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সাপ এর বংশ নির্বংশ করাটা সমস্যার সমাধান নয়। এর একমাত্র সমাধান সাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ভারতে Anti Snake Venom সিরামের উৎপাদন বৃদ্ধি।

সাপের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ না করে, সমাজের তথা হাসপাতালের তথা সরকারের কাছে আবেদন করুন - আর বলুন সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য Antivenom চাই। নিজেও বাঁচুন, সাপকেও বাঁচান, পরিবেশও বাঁচবে। কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গড়ে তুলুন - ওঝা, গুনীনকে তফাতে রাখুন।

— নীলেন্দু কেশ, মোঃ- ৭২৭৮২২৯৪৮৪

রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনে অ্যাসিড বৃষ্টি হবে

রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবন ও সংলগ্ন অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর ক্ষতি হবে ভয়াবহ। এই প্রকল্পটি ভারতের মধ্যপ্রদেশে করা যায়নি সে দেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে। অথচ বাংলাদেশে এই জনবিরোধী বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে যাচ্ছে সরকার। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আটটি সংগঠন আয়োজিত রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রভাব শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এ বক্তব্য দেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

সংবাদ সম্মেলনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রমেন্ট সায়েন্স ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ডঃ আবদুল্লাহ হারুন তাঁর গবেষণাপত্র তুলে ধরে বলেন, সুন্দরবনের পাশে বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মান হলে এ অঞ্চলের ভূগর্ভের উপরিভাগ ও ভূ-অভ্যন্তরের পানি নষ্ট হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে ওই অঞ্চলে অ্যাসিড রেইন (অম্লবৃষ্টি) হতে পারে। এমনকি পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাবে। লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ধ্বংস হবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ঢাল সুন্দরবন।

শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম ধরা হয়েছে প্রতি ইউনিট ৮টাকা। কিন্তু কয়লার দাম বাড়লে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১৪ টাকারও বেশি হবে। আমরা শুধু সুন্দরবন হারাব তাই নয়, অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ক্ষতিকারক হওয়ায় ভারত মধ্যপ্রদেশে এরকম তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে দেয়নি যে কোম্পানিটিকে সেই এনটিপিসি (ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন) কিভাবে বাংলাদেশের সুন্দরবন ধ্বংস করে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির নির্বাহী প্রধান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, গত ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য পরিবেশগত প্রতিবেদন দেওয়ার আগে এই প্রকল্পের সব কার্যক্রম বন্ধ রাখা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আসিফ নজরুল বলেন, আশা করি সরকারের মধ্যে যাঁরা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, এরকম ভয়ঙ্কর প্রকল্প থেকে সরে আসার জন্য তাঁরা সরকারকে বোঝাবেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাপার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন বলেন, বাংলাদেশে তাপভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার কোনো পরিবেশ নেই। আমরা এ ধরণের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিরোধিতা করছি। সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য দেন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি এ এস এম শাহজাহান ও প্রকৌশলী ম এনামুল হক। উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার শেখ মো জাকির হোসেন, সুশান্ত দাস প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক ৮টি সংগঠন হচ্ছে - বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটসমুভমেন্ট, সেভ দ্য সুন্দরবন ফাউন্ডেশন, কৃষি জমি রক্ষা কমিটি, বাগেরহাট উন্নয়ন কমিশন ও গ্রিনভয়েস। জানা যায় রামপালে সুন্দরবনের কাছে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে গত ২৯শে জানুয়ারী ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছে সরকার। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানির (এনটিপিসি) সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এ চুক্তি করে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশের ছাড়পত্র ছাড়াই জমি অধিগ্রহণ ও নদী ভরাটের কাজ করেছে পিডিবি। এর বাইরে কয়লা রাখার জন্য আরো ৬০০ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এই কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে।

হুগলি জেলার বলাগড়ে যে ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রস্তুত করবার জন্য ৫ কিমি রেডিয়াস চড়ে একটি তাপ বিদ্যুৎ তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (সি ই এস সি) তা ওই অঞ্চলের প্রায় ১০০০ মৎস্যজীবি ও ৩০০ কৃষিজীবিদের সাথে নিয়ে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আন্দোলন সংগঠিত করে বন্ধ করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশে রামপালে যে তাপ বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে তার সমর্থন চেয়ে ওই দেশের পরিবেশকর্মীগণ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার একদল বিজ্ঞানকর্মী এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে বাংলাদেশ যাবে। পশ্চিমবাংলার দিকে সুন্দরবনের আশেপাশে যেসব পরিবেশ ও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীগণ আছেন সুন্দরবন রক্ষার্থে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান।

— লেখকঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

পি এম ভার্গব বিজ্ঞানী পুরষ্কার ফিরিয়ে রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠি

"বর্তমান সরকার বিজ্ঞানের ব্যাপারে সব থেকে অজ্ঞ এবং এই নিয়ে কোনও মাথাব্যাথাও নেই তাদের। ধর্মীয় গোঁড়ামির এই আবহ, বিজ্ঞনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে, ফলত উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণের জন্য বড়ো বাধা।"

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোনঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com